দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ·· 0 9 SEP 2007
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

দেশে সাক্ষরতার হার ৬২ না ৪৫? সংজ্ঞা নিয়েও চলছে বিতর্ক

॥ নিজামুল হক ॥

দেশে সাক্ষরতার উপর কোন শুমারি না হওয়ায় সাক্ষরতার হারের কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। ফলে সাক্ষরতার হার নিয়ে চলছে বিতর্ক। সরকারি ও বেসরকারি হিসাব অনুযায়ী সাক্ষরতার হার ও সংজ্ঞায় রয়েছে ব্যাপক ফারাক।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৭ -এর তথ্য মতে, দেশে সাক্ষরতার হার (২০০২ সালে) ৬২ দশমিক ৬৬ শতাংশ। আর বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার তথ্য অনুযায়ী এ হার ৪৫ শতাংশের উপরে নয়। ইউনেস্কোর তথ্য অনুযায়ী সাক্ষরতার হার ৪১ দশমিক ৬ শতাংশ। । বেসরকরি সংগঠনগুলোর সমন্বয়কারী সংগঠন সাক্ষরতা অভিযান পরিচালিত ২০০২ সালে দেশের ১১ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাক্ষরতার হার ৪১ দশমিক ৪ শতাংশ। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক ৪৯ দশমিক ৪ শতাংশ অসাক্ষর।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেশে সাক্ষরতার হার ১৯৫১ সালে ছিল ২১ শতাংশ, ১৯৬১ সালে ২১ দশমিক ৫ শতাংশ, ১৯৭৪ সালে ২২ দশমিক ২ শতাংশ, ১৯৮১ সালে ২৩ দশমিক ৮ শতাংশ এবং ১৯৯১ সালে ৩৫ শতাংশ। এছাড়া বিভিন্ন সংগঠন পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, এদেশের নারীরা সাক্ষরতার হারে পুরুষদের তুলনায় ১২ শতাংশ পিছিয়ে আছে। আবার গ্রামীণ ও শহরের জনসাধারণের সাক্ষরতার হারে বড় ধরনের ব্যবধান আছে। এ ব্যবধান ২৬ শতাংশ। শহরের বস্তিবাসীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার সবচেয়ে শোচনীয়। জাতীয় পর্যায়ে সাক্ষরতার হার ৪১ শতাংশের বিপরীতে এদের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার ১৯ দশমিক ৭ শতাংশ।

সাক্ষরতার সংজ্ঞা নিয়েও চলছে বিতর্ক। শিক্ষার সর্বপ্রথম ধাপ হচ্ছে সাক্ষরতা। ইউনেস্কোর মতে, দৈনন্দিন (১৯শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

দেশে সাক্ষরতার

(২০শ পৃঃ পর)

জীবন সংক্রান্ত সাধারণ বক্তব্য-বিবৃতি পড়তে ও লিখতে পারাটাই হলো সাক্ষরতা। ১৯৪০-র দশকে পরিচালিত আদমশুমারিতে সাক্ষরতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, নিজের নাম লিখতে পারার যোগ্যতা। ১৯৫১ সালের আদমশুমারির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যে কোন ভাষায় বড় হরফে একটি বাক্য লেখার যোগ্যতাই হলো সাক্ষরতা। ১৯৭৪ সালের শুমারিতে বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় একটি সাধারণ লিখিত চিঠি পড়তে ও লিখতে পারার যোগ্যতাকে ধরা হয়েছে। ১৯৮১ সাল ও তার পরবর্তীতে পরিচালিত শুমারিতে বলা হয়েছে, যে-কোন ভাষার চিঠি লিখতে ও পড়ার যোগ্যতা। ১৯৯০ সালে সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৯২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পৃথকভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা নামে স্বতন্ত্র বিভাগ চালু করা হয়। ১৯৯২ সাল থেকে ৬৮টি থানায় এবং ১৯৯৩ সাল থেকে সারা দেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু হলেও পুরোপুরি তা আলোর মুখ দেখেনি।

১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনে ২০০০ সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৬২ শতাংশে উন্নীত করার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ। এছাড়া চুক্তিপত্রে ঝরে পড়ার হার ৩০ শতাংশে উন্নীত করারও ঘোষণা ছিল । সরকারের দেয়া তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে এখনো ঝরে পড়ার হার ৪০ শতাংশ। সরকারের তথ্য অনুযায়ীও ঝরে পড়ার হার কমেনি।

আমাদের দেশে সাক্ষরতার আন্দোলন নতুন কোন বিষয় নয়। ৫০ দশক থেকে এই আন্দোলন শুরু হয়ে বেশ কয়েকটি পর্ব ও কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ১৯৯৪ সালে সরকারি উদ্যোগে চালু হয় সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম)। এই কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি জেলাকে পুরোপুরি সাক্ষর করে গড়ে তোলার জন্য ৬ মাসব্যাপী একটি সামগ্রিক এবং সমন্বিত সাক্ষরতা কোর্সের আয়োজন করা হয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্যানুসারে ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে মোট ১ কোটি ৭০ লাখ মানুষ সাক্ষরতা আন্দোলন ও অন্যান্য যুব এবং বয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে। এতে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ সাক্ষরতা অর্জন করে বলে দাবি করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় দেশের ৬টি জেলাকে সম্পূর্ণ সাক্ষর বলে ঘোষণা করা হয়। তবে বেসরকারি সংগঠনগুলোর দেয়া তথ্যে এর সাথে কোন মিল নেই।

তাছাড়া এই কর্মসূচি হঠাৎ করে বন্ধ করে দেয়া হয়। নিরক্ষতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে গঠিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর ২০০৩ সালের নভেম্বরে অকার্যকর ঘোষণা করা হয়। শুধু চলামান কিছু কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখার জন্য ২০০৫ সালের ১৭ এপ্রিল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের জনবল নিয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে সাক্ষরতা জ্ঞানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য সম্বলিত কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে প্রদীপের মতো নিভু নিভু অবস্থায় টিকে আছে।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত, দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার লক্ষ্যে এ যাবৎ গৃহীত সব কর্মসূচির বেশিরভাগই ছিল আমলানির্ভর, গতানুগতিক নতুবা দাতানির্ভর সীমিত আকারের। তাদের মতে দেশের সাক্ষর জ্ঞানের হার বাড়াতে প্রয়োজন ব্যাপক দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক আন্দোলন।

গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রধান রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, সরকারের দেয়া তথ্যের সঙ্গে বেসরকারি সংগঠনের তথ্যের মিল থাকার কথা নয়। বেসরকারি সংগঠনগুলো বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য প্রকাশ করে । আর সরকারি প্রতিষ্ঠান শুধু জনগণকে প্রশ্ন করে তথ্য তৈরি করে। এ তথ্য নির্ভরযোগ্য হতেই পারে না। তিনি জানান, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার নামে দেশে যা চালানো হয়েছিল তা শুধু লোক দেখানো। এক্ষেত্রে লুটপাট হয়েছে কোটি কোটি টাকা। তিনি সাক্ষরতার হার নির্ধারণে সাক্ষরতা শুমারি পরিচালনার দাবি জানান। তিনি জানান, সরকার যে সংজ্ঞার ভিত্তিতে সাক্ষরতার হার নির্ধারণ করছে তাও যুক্তিযুক্ত নয়। এ সংজ্ঞা পরিবর্তন করা দরকার।

আহসানিয়া মিশনের প্রধান কাজী রফিকুল আলম বলেন, সাক্ষরতার সংজ্ঞায়ও ব্যাপক ব্যবধান হওয়ায় তথ্য বিভ্রাট হচ্ছে। তিনি সাক্ষরতার হার বাড়াতে দেশব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রম নেয়ার দাবি জানান। এছাড়া শুক্রবার প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সাক্ষরতা বাড়াতে হবে। দাতাদের পরামর্শ কিংবা তাদের প্রয়োজনের খাতিরে নয়, দেশের জন্য সাক্ষরতার হার বাড়াতে হবে। সেমিনারে অতীতে সরকারি খাতে কোটি কোটি টাকা অপচয়ের সমালোচনা করেন তারা।